সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্টের (সাধারণসভা) ১৩তম কাউন্সিল অনুষ্ঠিত

ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনকে সমাজ পরিবর্তনের আন্দোলনে পরিণত করুন

শ্রমিক ফ্রন্টের কাউন্সিল পরবর্তী কমিটি পরিচিতিসভায় বক্তব্য রাখছেন কমরেড খালেকুজ্জামান

সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্টের ১৩তম কেন্দ্রীয় কাউন্সিল (সাধারণসভা) ৫ জুলাই '১৯ এবং কমিটি পরিচিতিসভা ২৬ জুলাই '১৯ সেগুনবাগিচাস্থ স্বাধীনতা হলে অনুষ্ঠিত হয়। ফেডারেশনের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আবদুর রাজ্জাক এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক কমরেড খালেকুজ্জামান, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ। সভায় সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্টের ১৪তম কেন্দ্রীয় কমিটির নবনির্বাচিত নেতৃবৃন্দকে পরিচয় করিয়ে দেন কমরেড বজলুর রশিদ ফিরোজ। কাউন্সিলে রাজেকুজ্জামান রতন-কে সভাপতি; ওসমান আলী, আবদুর রাজ্জাক, শাজাহান তালুকদারকে সহসভাপতি, আহসান হাবিব বুলবুল-সাধারণ সম্পাদক; ইমাম হোসেন খোকন, নবকুমার কর্মকার, জনার্দনদত্ত নান্টুকে সহসম্পাদক ও খালেকুজ্জামান লিপন-কে সংগঠনিক সম্পাদক করে ২৫ সদস্যবিশিষ্ট নতুন কমিটি গঠন করা হয়।

পরিচিতি সভার আলোচনায় কমরেড খালেকুজ্জামান বলেন, আজকের সভার সভাপতি, নেতৃবৃন্দ ও কমরেডগণ। শুরুতেই সবাইকে পার্টি কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে সংগ্রামী শুভেচ্ছা। এখানে আমি শ্রমিক শ্রেণির অবস্থানের প্রেক্ষিতে ট্রেড ইউনিয়ন সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু কথা বলবো। সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্টের নতুন কমিটি আপনারা গঠন করেছেন। আপনারা সবাই মিলে কিছু কমরেডকে সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্ট—ফেডারেশনের বিভিন্ন কাজ পরিচালনার জন্য নির্দিষ্ট করে দায়িত্ব দিয়েছেন। তারা আপনাদের দেয়া অর্পিত দায়িত্ব অগ্রভাগে থেকে সম্পন্ন করবেন। যারা কমিটির সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন তারা একটা বিশেষ দায়িত্ব নিয়েছেন এবং যারা তাদের নির্বাচিত করেছেন তারা সবাই মিলে যৌথভাবে সর্বোচ্চ সাধ্যে দায়িত্ব পালন করবেন। সবাই মিলে যদি দায়িত্ব পালন না করেন, তা হলে কার্যকর কমিটি হয় না। আপনারা সবাই মিলে এক এবং অভিন্ন সত্তায় পার্টি পরিচালনায় ও নিজস্ব বুদ্ধি-বিবেচনায় সে দায়িত্ব পালন করবেন।

শ্রমজীবী মানুষ হলো তারাই, যারা শ্রম দিয়ে উৎপাদন করেন, সম্পদ তৈরি করেন, সভ্যতা নির্মাণ করেন এবং পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় শ্রমশক্তি বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করেন। আমাদের দেশের শ্রমজীবী মানুষের বড় অংশ—যারা কলকারখানায় কাজ করে পণ্য সামগ্রী উৎপাদন করে, কৃষক খেত-খামারে ফসল ফলিয়ে দেশের মানুষের মুখে আহার জোগায়; সেবা খাতে গতর খেটে শ্রমিক কাজে অংশ নেয়; বিদেশে থাকা শ্রমিক জীবনের ঝুঁকি নিয়ে হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে দেশে বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ে আসে। এরা সবাই সম্পদ সৃষ্টি করে কিন্তু এদের হাতে সেই সম্পদ কিংবা সম্পদের মালিকানা থাকে না। আবার যারা নিজেরা উৎপাদন করে না, মালিকী ব্যবস্থার কারণে তারা সম্পদের মালিক বনে যায়। একজন কৃষক—জমি পরিষ্কার করলো, হালচাষ করলো, বীজ লাগালো, সেচ-নিড়ানি দিলো, ওষুধ দিল, ফসল কেটে বাড়ি আনলো কিন্তু এত প্ররিশ্রম করে যখন খেতে বসলো তখন তার পাতে পুষ্টিকর খাদ্য নাই, হাতে টাকা নাই। ফসল চলে গেল মজুতদার, আড়তদারের হাতে। টাকা জমলো এদের ব্যাংকে। একইভাবে শ্রমিক পাট-তুলা থেকে সুতা বানালো, সুতা থেকে কাপড়, কাপড় থেকে জামা বানালো, ইট-কাঠ, পাথর-লোহা, সিমেন্ট দিয়ে বড় বড় বাড়ি বানালো কিন্তু জামা কিংবা বাড়ির মালিক সে হলো না। এটা কেন হয়? তা বুঝতে হলে জানতে হবে সম্পদ কীভাবে সৃষ্টি হয়? এই সম্পদ দুই ধরনের, একটা প্রাকৃতিক সম্পদ আরেকটা মনুষ্য সৃষ্ট সম্পদ।

দুই জন ইংরেজ অর্থনীতিবিদ অ্যাডাম স্মিথ ও ডেভিড রিকার্ডো বহু বছর আগে 'শ্রমের মূল্যতত্ত্ব' অবিষ্কার করে দেখিয়েছিলেন 'কোন দ্রব্যের মূল্য ওই দ্রব্যের মধ্যে নিহিত শ্রমের মূল্য অনুযায়ী নির্ধারিত হয়'। এই যে আমরা বলি—দাম বা মূল্য এগুলো কী? তারা দেখালেন কোন জিনিস যখন উৎপাদন করা হয় অর্থাৎ কোন বস্তুতে শ্রম দিয়ে নতুন কোন বস্তু উৎপাদন করলে তার দাম বা মূল্য তৈরি হয়। প্রাকৃতিক সম্পদ রূপান্তরিত হয়ে যে দাম তৈরি হলো সেটাই শ্রমিকের শ্রমে সৃষ্ট মূল্য। যেমন, বনের গাছের কোন দাম নাই, সেটা প্রকৃতি প্রদত্ত। যখন শ্রম দিয়ে গাছটা কাটা হলো, গাছ থেকে কাঠ তৈরি করা হলো, কাঠ দিয়ে আসবাবপত্র তৈরি হলো, তখন সেটার দাম দাঁড়ালো। খনি থেকে শ্রমিকরা আকরিক লোহা তুলে সেই লোহা দিয়ে নানা ধরনের জিনিস তৈরি করলো। আমরা যে কথা বলি, সেই মাইক তৈরি করলো সেটা সম্পদ হলো। তার মানে প্রাকৃতিক বস্তুর ওপর প্রত্যেকটা স্তরে শ্রম যুক্ত হওয়ার কারণে মূল্যবান সম্পদ তৈরি হয়। এটাকে বলে 'শ্রমের মূল্যতত্ত্ব'। অর্থনীতি বিজ্ঞানের এই নিয়ম সবাই মেনে নিয়েছে। কিন্তু একটা প্রশ্নের উত্তর তখনও পর্যন্ত কেউ দিতে পারলো না, সেটা হলো যারা শ্রম দিয়ে মূল্য সৃষ্টি করলো তারা কেন সে মূল্য পায় না? এই প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন কার্ল মার্কস। মার্কস দেখালেন, শ্রমিক শ্রম দিয়ে যে সম্পদ সৃষ্টি করে মালিকরা মজুরি হিসেবে তার একটা ক্ষুদ্র অংশ শ্রমিকদের দেয় আর বাকি বড়

অংশ নিজেরা আত্মসাৎ করে। যে অংশটা মালিক আত্মসাৎ করে সেই অংশটাই শোষণ। অর্থাৎ অসংখ্য শ্রমিকের শ্রমের একটা অংশ মালিক আত্মসাৎ করে বলে তাদের হাতে এত সম্পদ বাড়ে। সহজ করে বুঝার জন্য বললে, শ্রমিক ৮ঘণ্টা কাজ করে যদি তিন শ টাকার সম্পদ তৈরি করে, তাহলে দেখা যাবে কারখানা-জমির ভাড়া, মেশিনপত্রের অবচয়, বিদ্যুতের দাম, পুঁজির সুদ, কাঁচা মালের দাম সব মিলে এক শ টাকা খরচ হলো। মালিক এগুলোর খরচ বাবদ এক শ টাকা দিল, শ্রমিককে এক শ টাকা মজুরি দিল, নিজে এক শ টাকা পকেটে ঢুকালো। কার্ল মার্কস এটা অঙ্ক করে দেখিয়েছেন, মালিক নিজের পকেটে যে টাকাটা নিল সেটা শ্রমিকেরই সৃষ্টি সম্পদের একটা অংশের দাম। কার্ল মার্কস এটা দেখিয়েছেন, এটাকে উদ্বৃত্তমূল্য বলে।

এখন আবার আধুনিক মেশিনের সাহায্যে এক শ শ্রমিকের কাজ এক জন শ্রমিককে দিয়ে করানো হয়। ওই আধুনিক মেশিন তৈরি করেছে—হয় জাপানের শ্রমিক অথবা জার্মানি, ইংল্যান্ডের শ্রমিক। ওই মেশিন তৈরিতে শ্রমিকের যে শ্রম লেগেছে সেটা ওই মেশিনে মৃত শ্রম হিসাবে থাকে। কারণ ওই শ্রমিককে আপনারা এখন মেশিনের দিকে তাকালে দেখবেন না, কিন্তু তার শ্রমেই এই মেশিন তৈরি হয়েছে। এখন জাপানের ওই মেশিন তৈরির শ্রমিককেও ঠকানো হলো আবার এখানেও ওই মেশিন দিয়ে যে শ্রমিক পণ্য তৈরি করছে সেই শ্রমিককেও শোষণ করা হচ্ছে। আগে যদি একজন শ্রমিক দুই শ টাকার মূল্য তৈরি করতে পারতো এখন আধুনিক মেশিন দিয়ে সে দুই লাখ টাকার মূল্য তৈরি করতে পারে। আগে যদি শ্রমিককে দুই শ টাকা মজুরি দিত, এখন দেয় বড়জোর পাঁচ হাজার টাকা। ফলে এখন শোষণের মাত্রা সে তুলনায় অনেক বেশি। যত নতুন নতুন প্রযুক্তি, যন্ত্রপাতি আবিষ্কার হয়, তত বেশি তারা শ্রমিককে শোষণ করতে পারে, তত বেশি মালিকের মুনাফা বাড়ে। শ্রমিক যা উৎপাদন করলো মালিক তাকে একটা ক্ষুদ্র অংশ দিয়ে বাকিটা নিজে নিয়ে নেয় এই নিয়মটিই মার্কস এর 'উদ্বৃত্তমূল্য তত্ত্ব'। এই উদ্বৃত্তমূল্যটাই ছিল সমাজ ও শ্রমিকের প্রাপ্য, কিন্তু হয়ে যায় মালিকের মুনাফা বা লাভ।

এই কথাগুলো যাতে শ্রমিকরা বুঝতে না পারে সেজন্য তাদের এবং তাদের সন্তানদের উপযুক্ত শিক্ষা দেয়া হয় না, দাবি আদায় যাতে না করতে পারে সে জন্য তাদের সংগঠিত হতে দেয় না, আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত নিয়মে ট্রেড ইউনিয়ন করতে দেয় না। যাতে শ্রমিক সচেতন না হতে পারে সে ব্যাপারে তারা সব সময় তৎপর থাকে। কিন্তু আমরা বলি শ্রমিকদের শিক্ষা লাগবে, গণতান্ত্রিক অধিকার হিসাবে সংগঠিত হওয়ার, ট্রেড ইউনিয়ন করতে দিতে হবে। কার্ল মার্কস বলেছিলেন, ট্রেড ইউনিয়ন হচ্ছে শ্রমিকদের সাম্যবাদ শিক্ষার স্কুল। এর মধ্যে দিয়ে শ্রমিকরা শোষণ বুঝবে, শোষণের কারণ বুঝবে, সংগঠিত হলে যে শক্তি বাড়ে সেটা বুঝবে, ট্রেড ইউনিয়ন করতে পারলে যে দাবি আদায় করার ক্ষমতা বাড়বে সেটা বুঝবে। মালিকরা কোন দিন শ্রমিকদের এই শিক্ষা দিবে না। যে শিক্ষা এখন চলছে সে শিক্ষা দিয়ে শ্রমিক এগুলো বুঝতে পারবে না। আর যারা এগুলো বুঝতে পারবে তাদের লোভ-লালসা, সুবিধা দিয়ে শ্রমিকদের বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়ে দিবে। কিন্তু যে ট্রেড ইউনিয়ন শ্রমিকরা গড়ে তুলবে সেটা কেমন ধরণের ট্রেড ইউনিয়ন হবে? এটা কী শ্রমিক শ্রেণির মুক্তির আন্দোলনের একটি প্রতিষ্ঠান হবে? নাকি শোষণমূলক মালিকী ব্যবস্থা বহাল রেখে তার মধ্যে কিছু সুযোগ-সুবিধা পাবে, সামান্য বেতন বাড়বে, মালিকের স্বার্থের পক্ষের ট্রেড ইউনিয়ন হবে?

সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্ট এই ধরণের ট্রেড ইউনিয়ন নয়। এটা গড়ে তোলা হয়েছে এই কারণে যে, তারা শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়নের জন্য দাবি তুলবে, আন্দোলন করবে শক্তি সামর্থ্যের পরিমাপে দরকষাকষিতেও যাবে কিন্তু এই পুঁজিবাদী মালিকী ব্যবস্থা বহাল রেখে যে শ্রমিকমুক্তি-মানবমুক্তি আসবে না সে কথা ভুলবে না। তারা দেখাবে বাংলাদেশের শ্রমজীবী মানুষকে কীভাবে শোষণ করা হয় এবং এই শোষণের অবসান হবে কীভাবে। কেন মানুষ ধনী হয়, সম্পদের মালিক হয়। কেন মানুষ গরিব হয়, কেন সম্পদ হারা হয়। কোন পথে মুক্তি আসবে ইত্যাদি।

আগে বলা হতো সব মানুষ ভাই ভাই। মার্কস বলেছেন, মালিক আর শ্রমিক ভাই ভাই হতে পারে না। কারণ শ্রমিকরা এক জাতের আর মালিকরা আরেক জাতের। শোষক আর শোষিত দুই-এ মিলে ভাই ভাই হতে পারে না। শোষিত যারা তারা এক, এই শোষিতদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। দেশে দেশে ভিন্নতার কারণে একই দেশের সকল শ্রমিককে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। যাতে 'দুনিয়ার মজদুর এক হও!' স্লোগান কার্যকারিতা লাভ করতে পারে।

আর একটা বিষয় খেয়াল রাখা দরকার। সেটা হলো ধর্মের ভিত্তিতে শ্রমিকদের আলাদা করা হয়, নারী-পুরুষকে আলাদা করা হয়। কায়িক শ্রমজীবী ও মানসিক শ্রমজীবীকে আলাদা করা হয়। মালিকরা এই বিভাজনগুলো ইচ্ছা করে তৈরি করে, বাড়িয়ে দেয়। ধর্ম যার যার ব্যক্তিগত বিষয়। মালিক হিন্দু হোক আর মুসলমানই হোক সব শ্রমিককে একই নিয়মে শোষণ করে। হিন্দু কারখানার মালিক কি হিন্দু শ্রমিককে বেশি বেতন দেয়? দেয় না। মুসলমান মালিক কি মুসলমান শ্রমিককে বেশি বেতন দেয়? দেয় না। মালিকের হিন্দু-মুসলিম কোন ধর্ম নাই। তার আসল ধর্ম শ্রমিককে শোষণ-নির্যাতন করা। আমেরিকার শ্রমিকরা সাদা, মালিকও সাদা। আফ্রিকার শ্রমিকরা কালো মালিকও কালো। আমেরিকার সাদা মালিক সাদা শ্রমিককে শোষণ-নির্যাতন করে, আফ্রিকার কালো মালিক কালো শ্রমিককে শোষণ করে। মালিকের শোষণ-নির্যাতনের ক্ষেত্রে কালো-সাদা বলে কোন বিভেদ নাই। পাকিস্তানি মালিকরা বাঙালি শ্রমিককে শোষণ করেছিলো, একইভাবে পাকিস্তানি শ্রমিককেও শোষণ-নির্যাতন করেছে। পাকিস্তানের মালিকরা এখন পাকিস্তানি শ্রমিকদের শোষণ-নির্যাতন করে, বাঙালি মালিকরা বাঙালি শ্রমিকদের শোষণ করে। মালিকরা ধর্ম-বর্ণ, জাত-পাত, সাদা-কালো ইত্যাদি শ্রমিকদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টিকারী কথাগুলো প্রতিনিয়ত বলে। এগুলো শ্রমিকদের বুঝতে হবে, তা না হলে শ্রমিকরাও বিভ্রান্ত হয়ে পড়বে। এই কারণে আমাদের স্লোগান দুনিয়ার মজদুর এক হও! যত দিন শোষকশ্রেণির হাতে রাষ্ট্র ক্ষমতা থাকবে, মালিক-মজুর সম্পর্কের ভিত্তিতে মুনাফার উদ্দেশ্যে উৎপাদন

হবে, তত দিন শোষিত শ্রমজীবী মানুষের জীবনে শান্তি আসবে না। তাই শোষিত শ্রেণির হাতে, মেহনতি মানুষের হাতে রাষ্ট্র ক্ষমতা কব্জা করতে হবে। মালিকানা ব্যবস্থা উচ্ছেদ করে শোষণের অবসান ঘটাতে হবে। আমাদের এই দৃষ্টিভঙ্গি মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গি। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি। অন্যদের থেকে এখানেই শ্রমিক ফ্রন্টের রাজনীতি আলাদা।

সবাই বলে ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে ৩০ লাখ মানুষ জীবন দিয়েছে, এই ৩০ লাখ মানুষ কারা? আজকে যারা হাজার হাজার কোটি টাকার মালিক হয়েছে—এরা তাদের পরিবারের কেউ নয়। আজকে যারা মন্ত্রী-এমপি হয়েছে তাদের পরিবারের কয়টা মানুষ জীবন দিয়েছে—বলেন? জীবন দেওয়া মানুষগুলো এদেশের কৃষক-শ্রমিক, যুবক-নারী খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষ। এদের জীবনের বিনিময়ে দেশ স্বাধীন হলো কিন্তু রাষ্ট্র ক্ষমতা এই শ্রেণির মানুষের হাতে আসলো না। রাষ্ট্র ক্ষমতা চলো গেল উঠতি বাঙালি ধনীদের হাতে, যারা পাকিস্তানি ধনীদের জায়গায় নিজেদের দেখতে চেয়েছে তাদের হাতে। জীবন দিল শ্রমজীবী মানুষ আর রাষ্ট্রক্ষমতা গেল লুটেরাদের হাতে। মানুষ করলো দেশ স্বাধীন, তারা করলো দেশ দখল!

সেই কারণেই '৭১ সালে যে আকাঙ্ক্ষা নিয়ে মানুষ জীবন দিয়েছিলো, সে আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়িত হয় নাই। সাম্যের কথা বলে বৈষম্য হয়েছে। এই সমাজে শোষণে যত মানুষ গরিব হয় তত অসম্মানিত হয়, গরিব মানুষের মর্যাদা বলে কিছু থাকে না। সামাজিক ন্যায় বিচার বলে সমাজে কিছু নাই। টাকা না থাকলে বিচার পাবেন না। শাসকশ্রেণির দলের সাথে থাকলে আইনের উর্ধ্বে ওঠা যায়। জনগণের ক্ষমতায়নের কথা বলা হয়েছিল কিন্তু এখন রাতের বেলায় ভোট হয়ে যায়। স্বাধীনতার ঘোষণায় ছিল সাম্য, মানবিক মর্যাদা, সামাজিক ন্যায় বিচার এর অঙ্গীকার আর সংবিধানে লেখা হয়েছিল সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতার কথা। অথচ দেশে এখন স্বৈরতন্ত্র, পরিবারতন্ত্র, লুটপাটতন্ত্র আর সাম্প্রদায়িক ভণ্ডামি, দুর্বৃত্তায়িত রাজনীতি ও দুর্বৃত্তদের শাসন কায়েম হয়েছে।

এখন দেশের অবস্থা কী? মানুষ শেয়ার মার্কেটে টাকা খাটাতে যায় সেখান থেকে টাকা লুট হয়ে যায়, মানুষ ব্যাংকে টাকা গচ্ছিত রাখে সেখান থেকে টাকা চলে যায়, বিদেশ থেকে শ্রমিকরা টাকা পাঠায় সেটা পাচার হয়ে যায়, মানুষ ভ্যাট-ট্যাক্সের টাকা দেয় সেটা লুট হয়ে যায়। কৃষকরা ফসল ফলায় আর লাভের টাকা ফড়িয়া, দালাল, ক্ষমতাসীনদের হাতে চলে যায়।

প্রবাসী শ্রমিকের অবস্থা কী? ২০০৫ সাল থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত ৩৮ হাজার ৯৯৭ জন শ্রমিকের লাশ এসেছে বাংলাদেশে। কয়েক হাজার শ্রমিক এখন বিভিন্ন দেশের জেলখানায় আছে। আর ভূমধ্যসাগর, বঙ্গোপসাগরে কত শ্রমিক ডুবে মরেছে তার তো হিসাব নাই। বিভিন্ন দেশের গণকবরে বাঙালি শ্রমিকের লাশ আছে। এই শ্রমিক, যারা বিভিন্ন দেশে কাজ করছে তারা বেঁচে আছে দাসের মতো। আমাদের দেশের নারী শ্রমিক যারা বিদেশে আছে তাদের দুর্দশার শেষ নাই। তারা কাঁদতে কাঁদতে বিমান থেকে নামে আর নির্যাতনের বর্ণনা দেয়। গার্মেন্টসে কর্মক্ষেত্রে আগুনে পুড়ে দুই হাজারের বেশি শ্রমিক মৃত্যুবরণ করেছে, ভবন ধসে, নির্মাণ খাতে শ্রমিক মৃত্যুবরণ করছে। শিপ ইয়ার্ডে ৪/৫ শ শ্রমিক মৃত্যুবরণ করেছে। এরা সম্পদ সৃষ্টি করে আর বেঘোরে মারা পড়ে। তাদের কর্মক্ষেত্রে জীবনের নিরাপত্তা নাই আর কাজের স্থায়িত্বও নাই, নিয়োগপত্র-পরিচয়পত্র নাই। বেতন যা পায় তা দিয়ে ১০ দিনও চলে না। যা কিছু উন্নয়নের গল্প-কাহিনি তা তো মেহনতি মানুষেরই সৃষ্টি কিন্তু মেহনতি মানুষের প্রাপ্তি কী?

যারা আজকে শ্রমিক ফ্রন্টের নেতৃত্ব নির্বাচিত হয়েছেন, মনে রাখতে হবে আপনারা বঞ্চিত-অধিকারহীন শ্রমিকশ্রেণির মুক্তির দায়িত্ব নিয়েছেন। এটা নিষ্ঠার সাথে পালন করতে হবে। আমরা শ্রমিকশ্রেণির স্বার্থে যারা লড়াই করছি, জীবন দিচ্ছি কিন্তু রাজনীতি সচেতন না হওয়ায় ক্ষমতা লুটেরাদের হাতে চলে যাচ্ছে। আগামী দিনে এমনটা আর হতে দেয়া যাবে না। শ্রমিকশ্রেণির হাতে ক্ষমতা আনতে হবে। যেভাবে রক্ত ঢেলে জীবনবাজি রেখে দেশ স্বাধীন করেছে, সেই স্বাধীন দেশকে মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত চেতনা ও গণ-আকাঙ্ক্ষার পথে পরিচালনা করার যোগ্যতাও অর্জন করতে হবে। এই চ্যালেঞ্জে বিজয়ী হতে হবে।

বাংলাদেশে কাজের ক্ষেত্র আছে প্রায় চার শ ধরণের। আপনাদের লক্ষ্য থাকবে এর প্রতিটি ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিবে শ্রমিক ফ্রন্ট। বিদ্যুৎ, ওয়াসা, গ্যাস বিতরণী প্রতিষ্ঠান, ব্যাংক-বিমাসহ সেবা দানকারী বিভিন্ন ক্ষেত্রে কর্মচারীরা আছে তাদেরকেও শ্রমিক ফ্রন্টের সাথে যুক্ত করতে হবে। শ্রমিকদের সাথে কৃষকদের আন্দোলন সমন্বয় করতে হবে। শ্রমজীবী মানুষের সন্তানদের শিক্ষা ও কর্মপ্রাপ্তির অধিকারের প্রশ্নে তাদেরও সাথে রাখতে হবে। মানসিক শ্রমজীবী-পেশাজীবীদেরও টানতে হবে। শ্রমজীবী নারীসহ অর্ধেক জনসখ্যা নারীদেরকেও যুক্ত করতে হবে। অর্থাৎ পাঁচ ভাগ ধনিকশ্রেণির মানুষকে বাদ দিয়ে ৯৫ ভাগ মানুষকে যুক্ত করে লড়াইয়ে নামতে হবে। এই লড়াইয়ের সবচেয়ে সামনে থাকবে শ্রমিকশ্রেণি। আর বিপ্লবী পার্টি হিসেবে বাসদ সে লড়াই পরিচালনা করবে।

মৌলিক অধিকার ও গণতান্ত্রিক অধিকার কী? ভাত, কাপড়, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা, কাজ—এই অধিকারগুলো যদি সকল নাগরিকদের না থাকে তা হলে সে রাষ্ট্রকে স্বাধীন রাষ্ট্র বলা যায় না। আর মানুষের স্বাধীনভাবে চিন্তা করা, মতপ্রকাশ করতে পারা, সংঘঠিত হওয়ার অধিকার না থাকলে, মত-পথের মতাদর্শিক নিষ্পত্তির পর্বে জনপ্রতিনিধিত্বের মাধ্যমে দেশের সর্বস্তরে শাসন-প্রশাসন কায়েম করতে না পারলে সে রাষ্ট্রকে গণতান্ত্রিক বলা যায় না। রাষ্ট্রের কাজ কী? যেমন, একটা পরিবারের সদস্যদের স্বার্থ পরিবার কেন্দ্রিক হয় তেমনি গোটা দেশের নাগরিকদের স্বার্থ রক্ষার দায়িত্ব রাষ্ট্রের। কিন্তু এখন এই রাষ্ট্র ৯৫ ভাগ মানুষের স্বার্থের বিরুদ্ধে পাঁচ ভাগ ধনিক শ্রেণির স্বার্থ রক্ষা করে। এখন রাষ্ট্রটা হচ্ছে বুর্জোয়াদের হাতে তাই তাদের স্বার্থ রক্ষা করে। রাষ্ট্র এটা একটা যন্ত্র। এই যন্ত্র যার হাতে থাকে তার স্বার্থ রক্ষা করে। এই রাষ্ট্রকে শ্রমজীবীদের অর্থাৎ ৯৫ ভাগ মানুষের হাতে ছিনিয়ে নিয়ে আসতে হবে। তখন রাষ্ট্রযন্ত্র ৯৫ ভাগ মানুষের স্বার্থ রক্ষা করবে। এই যে জ্ঞান-বিজ্ঞান, প্রযুক্তি এগুলোও শ্রমিকশ্রেণির আবিষ্কার। অর্থাৎ তারা এগুলো আবিষ্কারের ক্ষেত্র রচনা করেছে। শ্রমিকরা যদি

মেহনত না করতো, তা হলে উন্নত জীবনের ভাবনাটা আসতো না। সেখান থেকে গবেষণার ক্ষেত্র তৈরি হতো না। যারা এগুলো নিয়ে কাজ করে তারাও একটা ভিত্তির ওপর কাজ করে। ওই জমিনটা তৈরি করে শ্রমিকশ্রেণি। বুর্জোয়ারা সেটাকে দখল করে নিয়েছে। প্রকৃতিতে শ্রম প্রয়োগ করতে গিয়ে শ্রমিকশ্রেণি জ্ঞান-বিজ্ঞানের যে ভিত্তি রচনা করেছে, সে জায়গা থেকেও তারা শ্রমিকশ্রেণিকে বঞ্চিত করেছে। সম্পদ দুই ধরণের। একটা হলো বস্তুগত সম্পদ আরেকটা হলো ভাবগত সম্পদ। বস্তুগত সম্পদ কায়িক শ্রমে শ্রমিকশ্রেণি তৈরি করে আর ভাবগত সম্পদের ভিত্তিও রচনা করে সেই ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে সাহিত্যিক, দার্শনিক, বিজ্ঞানী ইত্যাদি মানসিক শ্রমজীবীরা যেভাবে সম্পদ সৃষ্টি করে সেটা থেকেও শ্রমিকশ্রেণিকে, সাধারণ জনগণকে বঞ্চিত করা হয়েছে। বুর্জোয়ারা সেটা কব্জায় রেখে লুটপাটের কাজে ব্যবহার করে। তাই এগুলো সম্পর্কে শ্রমিক ফ্রন্টের প্রত্যেক সদস্যকে সচেতন হতে হবে। তারা ইতিহাস জানবে, সমাজবিজ্ঞান জানবে, অর্থনীতি জানবে, কীভাবে শোষণ হয় সেটা জানবে। আর কীভাবে লড়াই করে জিততে হবে সেটা বুঝতে পারবে। শ্রমিকদের সচেতন না করলে কোনটা মালিকের স্বার্থ রক্ষাকারী সংগঠন, কোনটা প্রকৃত শ্রমিকশ্রেণির স্বার্থরক্ষাকারী সংগঠন তা ধরতে পারবে না। সঠিক বেঠিক যাচাই-বাছাই করার মানদণ্ড তাদের হাতে থাকবে না। একথাগুলো আপনাদের বুঝতে হবে, প্রচার করতে হবে।

বুর্জোয়াদের টাকার শক্তি আছে। টাকা দিয়ে তারা যা করতে পারবে শ্রমিকরা নিজেরা গায়গতরে খেটে নিজস্ব শক্তিতে বহুগুণ বেশি করতে পারবে। সাড়ে ছয় কোটি শ্রমিক যদি এক টাকা করে দেয় তা হলে সাড়ে ছয় কোটি টাকা হবে, ১০ টাকা করে দিলে প্রায় সাড়ে ৬৩ কোটি টাকা হবে। এই টাকা দিয়ে মালিকদের হাজার হাজার কোটি টাকাকে পরাস্ত করতে পারবেন। শ্রমিকদের নিজেদের সমস্যা হলে যাতে মোকাবিলা করতে পারে আর যে কোন ধরণের আক্রমণ—মামলা-মোকাদ্দমা, হামলা যাতে মোকাবিলা করতে পারেন সেজন্য ঐক্যবদ্ধ হতে হবে, সচেতন হতে হবে। দেশে পুলিশ থাকতে আবার ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশ করছে কেন? করেছে মালিকের স্বার্থে। কারণ, তারা শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ শক্তিকে ভয় পায়। মালিক মজুরি না দিলে, বেআইনিভাবে কারখানা বন্ধ করে দিলে তারা নিশ্চুপ থাকে আর শ্রমিকরা প্রতিবাদী হলে তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। এটাই তো বাস্তবতা। সংগঠন আন্দোলন পরিচালনাকারী ব্যক্তিরা একদিন না থাকতে পারে কিন্তু শ্রমিকশ্রেণির বিপ্লবী দল থাকবে। সেই দলের নেতৃত্বে লড়াই চালিয়ে যেতে হবে। এই দলের শক্তি দিয়েই আগামী দিনে মানুষের দুঃখ-দুর্দশার অবসান হবে।

দেশের এই অবস্থা পরিবর্তনের শক্তি কারা ধারণ করে? করে শ্রমিকশ্রেণি। তারা পারে না এমন কোন কাজ নাই। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ও সুন্দর ইমারত, রাস্তা, বড় বড় কারখানার আধুনিক মেশিন, বিলাসবহুল গাড়ি, বড় বড় ব্রিজ তারাই তো তৈরি করে, লোহাগলিয়ে রড বানায়, মাটির নিচ থেকে খনিজ পদার্থ তুলে আনে। তাদের অসাধ্য কিছু নাই। এরাই বাংলাদেশকে বিশ্বের দ্বিতীয় গার্মেন্টস রপ্তানিকারক দেশে পরিণত করেছে।

শ্রমিকরা যে কোন সেক্টরেই কাজ করুক না কেন তাদের নিজেদের মধ্যে ঐক্য থাকতে হবে। একটা কারখানার শ্রমিকদের ওপর আক্রমণ হলে সব কারখানার শ্রমিকদের তার প্রতিবাদ করতে হবে। শ্রমিকদের মধ্যে সে বোধ গড়ে তুলতে হবে। মালিকরা একটা জায়গায় আঘাত করলে শ্রমিকরা হাজার জায়গা থেকে তার প্রতিবাদ করবে। দেশের অভ্যন্তরে এই শ্রমিক ঐক্য সাধনের পথে দুনিয়ার শ্রমজীবীদের ঐক্যের প্রতিষ্ঠান বিশ্ববিস্তারে ধ্বনিত হবে। এই হচ্ছে শ্রমিকের স্বার্থের শক্তি। মানুষের পায়ে ব্যথা পেলে যেমন মাথায় খবর হয়ে যায় তেমনি দিনাজপুরে শ্রমিকের ওপর আক্রমণ হলে চট্টগ্রামে খুলনায় তার প্রতিবাদ হতে হবে। আর বিপ্লবী দল বাসদের সাথে ছাত্র-যুবক, কৃষক-খেতমজুর, নারী, শিল্পী-সাহিত্যিকদের যুক্ত করতে হবে। আপনাদের সবার পরিবারের সদস্যদেরও এর সাথে যুক্ত করতে হবে। আপনারা নারীদের অসম্মান করবেন না, তাদের মর্যাদা দিবেন। স্ত্রী-সন্তানদের মর্যাদা না দিলে নিজেরা কীভাবে মর্যাদা দাবি করবেন। অধিকার বঞ্চিত যত মানুষ আছে তাদের মালার মতো করে এক সুতায় আমাদের বাঁধতে হবে। আপনারা এমন কাজ করবেন না যাতে শুরুতে আপনাদের অস্তিত্ব বিপণ্ন হয়ে যায়, আবার চুপ করে বসে থাকবেন না, যাতে শাসকশ্রেণি নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পারে। প্রতি মুহূর্তে অধিকার নিয়ে আওয়াজ তুলতে হবে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ গড়ে তুলবেন। প্রতি মুহূর্তে লড়াইয়ে থাকতে হবে কিন্তু শেষ আঘাত করতে হবে সকল শোষিত মানুষদের নিয়ে শ্রমিক শ্রেণির নেতৃত্বে বাসদ শ্রমিকশ্রেণির দল হিসেবে এই আন্দোলন পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছে। শোষণের বিরুদ্ধে কোন লড়াইয়ে শ্রমিকশ্রেণিকে কেউ পর্যুদস্ত করতে পারবে না। শোষকের যত বড় শক্তিই হোক তাকে মোকাবিলা করার সাহস এবং স্পর্ধা শ্রমিকশ্রেণি রাখে। আগামী বছর হাজার হাজার শ্রমিকের একটা জমায়েত করতে পারলে সেটা মানুষের মধ্যে আশা জাগাবে। তারা দেখবে এই শ্রমিকরা টাকার বিনিময়ে আসেনি—তাদের একটা লক্ষ্য আছে, স্বপ্ন আছে। এই লক্ষ্য ও স্বপ্ন শুধু তাদের নিজেদের জন্য নয় এদেশের মানুষের জন্যও সেটা। ২৫ সেপ্টেম্বর ছাত্র ফ্রন্ট ছাত্রদের জমায়েত করবে এটা বর্তমান দুঃসময়ের অচলায়তন ভাঙতে ও আশা জাগাতে সাহায্য করবে। এটাও আপনাদের কর্মসূচি। কৃষকদের জমায়েত হবে, নারীদের শক্তি হাজির করতে হবে। উন্নত সংস্কৃতির আলো ছড়িয়ে মনে-মননে রূপান্তর ঘটাতে হবে। এভাবেই এদেশের মানুষের স্বপ্ন বাঁচিয়ে রাখবো, স্বপ্ন পূরণ করবো। এই শক্তি দিয়ে গোটা দেশের মানুষের প্রাণশক্তি জাগিয়ে তুলতে পারবো। মানুষ দেখবে এটা একটা ভিন্ন জাতের শক্তি। এশক্তি আপষ করে না, লুটপাট করে না, দালালি করে না, টাকার কাছে বিক্রি হয়ে যায় না। ন্যায় সঙ্গত দাবিতে লড়াই করে এরা জগতের সবচেয়ে বড় মহান আদর্শ মার্কসবাদ-লেনিনবাদ ধারণ করে শোষণমুক্তির সংগ্রামে আগুয়ান। জয় শ্রমিকশ্রেণির হবেই। জয় সমাজতন্ত্র, জয় শোষিত মেহনতি জনতার জয়।